# বিশ্ব সেরা বিদেশি গল্প

সম্পাদনা

অমলেন্দু মুখোপাধ্যায়

অনুবাদ

নূপুরশিঞ্জন ভট্টাচার্য

পুনশ্চ

# গ্র ন্থ প্র স ঙ্গ

নানা সময়ে পঠিত যেসব বিদেশি ছোটো গল্প নানা বিচিত্র বৈশিষ্ট্য নিয়ে আমাদের মনে স্থায়ী রেখাপাত করেছে তার মধ্যে থেকে বেছে নিয়ে পঞ্চাশটি গল্পের অনুবাদ এই সংকলনে সন্নিবেশিত হল। অনুবাদ মৌলিক শিল্পকর্ম নয়, মহৎকর্ম তো নয়ই, তবে বেশ দুরূহ কর্ম। একটি সপ্রাণ সাহিত্যসৃষ্টিতে শুধু আঙ্গিক অথবা মূল ভাব কিংবা বিষয়বস্তুজাতীয় উপাদানই নয়, তার সর্বাঙ্গ জড়িয়ে থাকে একটি বিশেষ ভাষা—তার গঠন, তার ধ্বনিময়তা, তার চলার ছন্দ, তার বাক্‌প্রতিমা, তার নিজস্ব সংলাপ, আচরণ, বাগ্‌ধারায় সমাজের, ভূগোলের, ইতিহাসের, অর্থনীতির নানাবিধ জটিল প্রতিফলন—এইসব মিলিয়ে ভাষার মধ্যেই থাকে সেই জাতির অন্তরতর সুর। একটি বিশেষ ভাষার যাবতীয় ঐতিহ্য যেহেতু সম্পূর্ণভাবে একটি বিশেষ সমাজের মানুষের, ওই ভাষা ওই সমাজের মধ্যে আজন্ম অথবা চেতনার উন্মেষ থেকে লালিত না হলে সাধারণত তা অলব্ধই থেকে যায়। ভাষান্তরে তা সঞ্চারিত করা তাই বড়োই কঠিন। সাহিত্যরস স্বাদু পানীয়ের মতোই; তার রূপ অনেকটাই আধারনির্ভর। আধার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে শুধু যে রূপের পরিবর্তন হয় তাই নয়, সেই সঙ্গে কিছু গন্ধ আর উত্তাপও বুঝি হারায় ওই স্বাদু পানীয়। কিন্তু তবু তো কিছু থেকে যায়। তন্নিষ্ঠ অনুবাদে থেকে যায় এক আদল, এক আভাস, চরিত্রসৃষ্টির মধ্য দিয়ে, ঘটনাবিন্যাসের মধ্য দিয়ে, প্রকাশিত কাহিনি বা তার স্কেচের মধ্য দিয়ে উন্মোচিত হয় লেখকের সমাজভাবনা, তাঁর জীবনবোধ। দক্ষ ও অভিজ্ঞতর অনুবাদে তা হয়তো হয় কিছুটা স্পষ্টতর।

অনুবাদকর্মে তাই যথেষ্ট সতর্কতা সহকারে মূলানুগ হওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। লেখকের লেখনশৈলী, আঙ্গিক, শব্দ ব্যবহার বা বর্ণনার বিশেষ প্রবণতাগুলিকে লক্ষ করে ভাষান্তরে তার আভাস আনারও চেষ্টা হয়েছে। দু'একটি রহস্যগল্প ছাড়া অন্য কোনো গল্পকে সংক্ষেপিত করা হয়নি। তথাপি বিদগ্ধ পাঠক, নানা বিদেশি ভাষা ও সাহিত্যে যাঁদের অবাধ সন্তরণ, যদি এই বইটি পড়ে দেখার গুরুত্ব দেন, হয়তো কিছু দোষত্রুটি দুর্বলতা খুঁজে পাবেন (যেমন, স্থান বা পাত্রপাত্রীর নামের সঠিক উচ্চারণ বিষয়ে)। তেমন ত্রুটিবিচ্যুতির জন্য আগাম মার্জনা চেয়ে রাখছি।

আমাদের তরফে যে কথাটা আগেই বলে নেওয়া উচিত ছিল তা হল—এই অনুবাদকর্ম সেইসব অগণনন আগ্রহী বাঙালি পাঠক-পাঠিকাকে লক্ষ করে যাঁরা

দুর্ভাগ্যবশত বাংলা ভিন্ন অন্য কোনো বিদেশি ভাষায় সাহিত্যপাঠের সুযোগ বা সামর্থ্য থেকে বঞ্চিত। তাঁদের কাছে এই গ্রন্থ পৌঁছোলেই আমার পরিশ্রম চরিতার্থ হবে।

অনুবাদকর্মে আমাদের চাহিদামতো বই জুগিয়ে ও পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করেছেন শ্রীকান্ত বসু ও বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। এঁদের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতার শেষ নেই।

জানুয়ারি ২০১৪

অমলেন্দু মুখোপাধ্যায়
নূপুরশিঞ্জন ভট্টাচার্য

# সূ চি প ত্র


অলিভার গোল্ডস্মিথ

দ্য ডিসেবল্ড্ সোলজার ১৩

আলেকজান্ডার পুশকিন

দ্য শট ১৯

আনোরে দ বালজাক

দি একজিকিউশনার ৩১

দ্য মেড অব্ থিলৌজ ৩৯

আলেকজান্ডার ডুমা

জোডোমিরস্কি'স ডুয়েল ৪৭

নাথানিয়েল হথোর্ন

দ্য মিনিস্টার'স্ ব্ল্যাক ভেল ৬১

মিসেস বুলফ্রগ ৬৯

এডগার অ্যালেন পো

দ্য টেল-টেইল হার্ট ৭৭

দ্য পিট অ্যান্ড দ্য পেন্ডুলাম ৮০

চার্লস ডিকেন্স

দ্য পুওর রিলেশন'স্ স্টোরি ৮৫

গটফ্রিড কেলার

আ লিট্‌ল লেজেন্ড্ অব্ দ্য ড্যান্স্ ৯৫

হারম্যান মেলভিল

দ্য ফিড্‌লার ১০১

ফিওডর দস্তয়েভ্স্কি

দ্য ক্রিসমাস ট্রি অ্যান্ড দ্য ওয়েডিং ১০৯

লিও টলস্টয়

দ্য থ্রি কোয়েশ্চন্স্ ১১৭

গড সিজ দ্য ট্রুথ বাট ওয়েটস্ ১২১

মার্ক টোয়েন

লাক ১২৯

এমিল জোলা

দ্য মেড অব্ দ্য ডবার ১৩৫

গী দ মোপাসাঁ

সাইমন'স পাপা ১৪১

দ্য পিস অব্ স্ট্রিং ১৪৮

জেরোম কে জেরোম

আ ফিশি স্টোরি ১৫৫

আর্থার কোনান ডয়েল

আ পয়েন্ট অব্ কনট্যাক্ট ১৬১

আন্তন চেখভ

দ্য বেট ১৬৯

ও হেনরি

আফটার টোয়েন্টি ইয়ারস্ ১৭৭

দ্য ক্ল্যারিয়ন কল ১৮০

ডব্লিউ ডব্লিউ জাকবস্

দ্য মানকি'স্ প ১৮৯

ইন দ্য লাইব্রেরি ১৯৯

রুডইয়ার্ড কিপলিং

দ্য গার্ডেনার ২০৯

এইচ জি ওয়েলস

দি ইনেক্স্পিরিয়েন্সড্ গোস্ট ২১৯

দি অ্যাপল ২২৯

আর্নল্ড বেনেট

দি ইডিয়ট ২৩৭

ম্যাক্সিম গোর্কি

ওয়ান অটাম নাইট ২৪৫

আ ম্যান ইজ বর্ণ ২৫২

হার লাভার ২৬১

স্টিফেন লিকক
মাই লস্ট ডলার ২৬৭
সাকি
দ্য স্টোরি টেলার ২৭১
ডাস্ক ২৭৬
দি ওপন্ উইনডো ২৮০
ওয়াল্টার ডি লা মেয়ার
ব্যাড কম্পানি ২৮৫
ক্ল্যারেন্স ডে
ফাদার ওয়েকস আপ দ্য ভিলেজ ২৯৩
রাইনার মারিয়া রিল্‌কে
জিম পিরিয়ড ৩০১
জ্যাক লন্ডন
দ্য লেপার্ড ম্যান'স স্টোরি ৩০৭
রবার্ট ওয়ালসার
আ ভিলেজ টেল ৩১৩
ভার্জিনিয়া উল্‌ফ্
ল্যাপ্‌পিন অ্যান্ড ল্যাপিনোভা ৩১৭
জেমস জয়েস
ইভলিন ৩২৭
অ্যান এনকাউন্টার ৩৩১
ফ্রান্‌জ্ কাফ্‌কা
ইন দ্য পেনাল কলোনি ৩৩৯
জর্জ হেইম
দি অটপ্‌সি ৩৬৩
ক্যাথরিন ম্যানস্ফিল্ড
দ্য ডল'স হাউস ৩৬৭
আর্নেস্ট হেমিংওয়ে
দ্য থ্রি-ডে ব্লো ৩৭৫
আলব্যার কামু
দ্য গেস্ট ৩৮৭

# অলিভার গোল্ডস্মিথ

জন্ম : ১৭২৮; কাউন্টি লংফোর্ড, আয়ারল্যান্ড। উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি : দ্য ভাইকার অব্ ওয়েকফিল্ড। মৃত্যু : ১৭৭৪।

# দ্য ডিসেবল্‌ড্‌ সোলজার

পৃথিবীর অর্ধেক মানুষই জানে না বাকিরা কীভাবে বেঁচে আছে; অতি সাধারণ কথা কিন্তু এর চেয়ে বড়ো সত্য আর কিছু হয় না। মহৎ ব্যক্তিদের দুঃখ-দুর্ভাগ্যের কথা এমন করে তুলে ধরা হয়, এত আবেগময়ী ভাষায় ঘোষণা করা হয় যে আমাদের মন কেড়ে নেয়; সারা দুনিয়ার দৃষ্টি পড়ে এই সব মহান দুঃখীদের ওপর। বিপর্যয়ের চাপের মধ্যেও তাঁরা জানেন যে তাঁদের দুঃখকষ্টের প্রতি রয়েছে অজস্র মানুষের সমবেদনা, করুণ দৃষ্টি; আর এই সপ্রশংস করুণায় এক ধরনের আনন্দও পান তাঁরা।

সারা পৃথিবী যদি তোমার দিকে তাকিয়ে থাকে তাহলে তোমার শান্ত ধৈর্যে দুঃখবহনের মধ্যে কী এমন মহানুভবতা? এমন অবস্থায় তো লোকে অহমিকার বশেই সাহসিকতা দেখাবে। কিন্তু যে-মানুষ অখ্যাতির, অপরিচয়ের খাদের মধ্যে বাস করেও সাহস করে সমস্ত প্রতিকূলতার সম্মুখীন হতে পারে; উৎসাহ দেওয়ার কোনও বন্ধু নেই, পরিচিত কেউ নেই করুণা করার, এমনকি তার দুর্দশাভার লাঘব হওয়ারও কোনো আশা নেই জেনেও যে-মানুষ প্রশান্ত উদাসীন থাকতে পারে সেই তো প্রকৃত মহৎ; চাষিই হোক বা রাজসচিব হোক সে প্রশংসার্হ; অনুকরণীয় ও শ্রদ্ধার্হ বলে তাকেই সকলের চোখের সামনে তুলে ধরা উচিত।

বড়ো মানুষদের সামান্যতম অসুবিধাগুলোকেও বিপর্যয় বলে বড়ো করে দেখানো হয়; তাদের দুঃখযন্ত্রণার কথা নানা সুরে নানা ভাষার অলংকারে উচ্চারিত হয় বিষাদবিধুর নাটকে উপন্যাসে; আর দরিদ্রের দুঃখদুর্দশার কাহিনি থাকে উপেক্ষিত; অথচ নিচুতলার কিছু মানুষ একটা দিনে যে কষ্টভোগ করে, তা হয়তো সারাজীবনেও ভোগ করতে হয়নি ওই মহাপুরুষদের অনেককেই। আমাদের সাধারণ নাবিকদের বা সৈনিকদের নিম্নতম অংশ যে কী দারুণ দুঃখ দুর্বিপাক নিঃশব্দে নিরুত্তাপে সয়ে থাকে তা ধারণা করা যায় না। তারা বিধাতার কাছে সোচ্চারে নালিশ জানিয়ে কপাল চাপড়ায় না, আবার তাদের নির্ভীকতার প্রতি পরিচিত পরিজনদের নজর টানতেও চায় না তারা। প্রতিটা দিনই তাদের কাছে দুঃখযন্ত্রণার, তবু তারা ক্ষোভলেশহীন মনে নির্দয় কঠিন দিনগুলোর মুখোমুখি দাঁড়ায়।

একজন ওভিদ ও সিসেরো অথবা বাবুটিন-এর দুর্ভাগ্য আর দৈন্যদশার কাহিনি শুনে কী ক্ষোভই না হয় আমাদের; অথচ তাঁদের জীবনের সবচেয়ে বড়ো দুঃখ কী—না যে তাঁরা তাঁদের অবুঝ কল্পনায় বিশ্বের যে বিশেষ ভূখণ্ডটিকে সুখস্বর্গ বলে ভেবেছিলেন সেখানে যেতে পারেননি। যে অসংখ্য দরিদ্র মানুষ জীবনের প্রতিটি অনিশ্চিত দিন যাপনের যন্ত্রণা নীরবে সহ্য করে, তাদের কষ্টের তুলনায় মহৎদের ওই কষ্ট তো দুঃখবিলাসের সুখমাত্র! তাঁদের খাদ্য ছিল, পানীয় ছিল, ছিল সুনিদ্রার আয়োজন, সেবা করার জন্য ক্রীতদাস, জীবনের নিশ্চিত সংস্থান ছিল তাঁদের; অথচ

তাঁদেরই আশপাশের বহু মনুষ্যজীব বন্ধুবান্ধবহীন, নিঃসহায়, নিরাশ্রয় হয়ে এখানে-ওখানে ঘুরে মরতে বাধ্য হয়।

সেদিন হঠাৎ পথের মধ্যে এমনই এক হতভাগ্য মানুষের সঙ্গে দেখা হওয়ার পর থেকে এইসব চিন্তাই ঘুরে ফিরে আসছিল আমার মনে। লোকটিকে আমি বাল্যকালে চিনতাম। পরনে নাবিকের পোশাক, একটি পা কাঠের; শহর থেকে বেরোনোর একটা রাস্তার এক কোণে দাঁড়িয়ে ভিক্ষে করছে। গ্রামে যখন থাকতাম এই লোকটিকে দেখেছি—সৎ পরিশ্রমী মানুষ। কী করে এই মর্মান্তিক করুণ অবস্থা তার, জানতে আমার ভারী কৌতূহল হল। তাই আমার বিবেচনা মতো তাকে যথাসম্ভব কিছু দিয়ে আমি জানতে চাইলাম তার জীবনেতিহাস আর দুর্ভাগ্যের কাহিনি। লোকটা একটু মাথা চুলকাল। তারপর আমার অনুরোধ রেখে শুরু করল : 'দুর্ভাগ্যের কথা যদি বলেন তো বলতে হয়, আমি যে জীবনে আর পাঁচ-দশটা লোকের চেয়ে অনেক বেশি কষ্ট পেয়েছি এমন ভান করতে পারব না। আমার শুধু একটা পা গেছে আর একটু ভিক্ষে করতে হচ্ছে বই তো আর কিছু নয়। আমাদের রেজিমেন্টের বিল টিব্‌স্-এর তো দুটো পা-ই নেই, আবার একটা চোখও গেছে। ঈশ্বরের কৃপায় আমার তো এখন অবধি তত খারাপ কিছু হয়নি।

'আমার জন্ম শ্রপশায়ার-এ। বাবা ছিল শ্রমিক; তো আমার পাঁচ বছর বয়সেই বাবা মারা গেল। তাই আমাকে গ্রামের পাদ্রিসাহেবের কাছে আশ্রয় দেওয়া হল। ওঁর ছিল ঘুরে বেড়ানো স্বভাব। ওখানকার কেউ বলতে পারল না কোথায় আমার জন্ম; তাই তারা আমাকে আরেক গ্রামে আরেকজন পাদ্রির কাছে পাঠাল; সেখান থেকে আবার আরেকজনের কাছে, এই রকম। আমি মনে ভাবলুম ওরা আমাকে এতদিন ধরে এত জায়গায় পাঠাচ্ছে যে আমি যে আদৌ কোথাও জন্মেছি তাও বোধহয় ভাবতে দেবে না। যাই হোক, শেষ পর্যন্ত ওরা আমাকে এক জায়গায় থিতু করল। আমার পড়াশোনা করার ইচ্ছে ছিল তাই ভাবলুম অন্তত অক্ষরজ্ঞানটা লাভ করি। কিন্তু আমি হাতুড়ি চালানো শিখতে না শিখতেই কারখানার মালিক আমাকে ব্যবসায় ঢুকিয়ে দিল। ওখানে বছর পাঁচেক আমি বেশ ভালোই ছিলুম। দিনে মাত্র দশ ঘণ্টা হাতুড়ি পেটাতে হত; মজুরি পেতুম মাংস আর মদ। অবশ্য আমাকে যে বাইরে যেতে দেওয়া হত না, তা ঠিক; ওরা বলত, আমি পালিয়ে যেতে পারি সেই ওদের ভয়। কিন্তু তাতে অসুবিধের কী আছে? আমি তো বাড়ির চৌহদ্দির মধ্যে অবাধে ঘুরে বেড়াতে পারতুম, দরজার বাইরে উঠোনটায় যেতে পারতুম; আমার পক্ষে তা-ই যথেষ্ট ছিল। তারপর আমাকে চাষির কাছে বাঁধা দেওয়া হল। সেখানে অবশ্য আমাকে খুব ভোরে উঠতে হত আর অনেক রাত পর্যন্ত জাগতে হত। তবে খাবারদাবার ভালোই, আর কাজটাও আমার পছন্দই ছিল। কিন্তু লোকটা মরে গেল। আর তখনতো আমায় নিজেই নিজের রুটির জোগাড় করতে হবে, তাই ঠিক করলুম ভাগ্যান্বেষণে বেরিয়ে পড়ব।

'এইভাবে এক শহর থেকে আরেক শহরে ঘুরতে লাগলুম। কাজ জুটলে কাজ করতুম, আর কাজ না থাকলেই উপোস। একদিন ঘটনাচক্রে এক মাঠের মধ্য দিয়ে হাঁটছিলুম; মাঠটা এক বিচারকের। হঠাৎ নজরে পড়ল সামনে দিয়ে একটা খরগোশ যাচ্ছে। কী যে দুর্মতি হল আমার, খরগোশটা মাথা লক্ষ করে হাতের লাঠিটা ছুঁড়ে মারলুম। খরগোশ তো অক্কা। কিন্তু তারপর কী হল জানেন? মরা খরগোশটা নিয়ে চলে যাচ্ছি, হঠাৎ স্বয়ং বিচারকমশাই-এর মুখোমুখি। তিনি আমাকে চোরা শিকারি, শয়তান ইত্যাদি বলে আমার কলার ধরলেন, কৈফিয়ত চাইলেন। আমি আমার জাত গোত্র বংশপরিচয় যতটুকু জানি সব বলে হাঁটু গেড়ে বসে ক্ষমা চাইলুম। কিন্তু উনি

আমার কথায়, অনুরোধে কর্ণপাতই করলেন না। বিচার হল আমার। গরিব হওয়াই তো অপরাধ। আমাকে লন্ডনের নিউ গেট-এ পাঠিয়ে দেওয়া হল।

'লোকে জেলের জীবন নিয়ে কত কী বলে, কিন্তু আমি তো দেখলুম নিউ গেট-এ জেল-জীবন মন্দ কিছু নয়। এযাবৎ যেমন কেটেছে সেই রকমই। তাছাড়া পেট ভরে খাবারদাবার পেতুম, কোনো কাজও করতে হত না। কিন্তু এরকম জীবন তো আর বেশিদিন থাকে না; তাই পাঁচ মাস পরে আমাকে জেল থেকে বার করে আনা হল। আমার মতো আরও দুশো জনের সঙ্গে জাহাজে করে পাঠিয়ে দেওয়া হল তামাক- বাগানে। সমুদ্রযাত্রাটা তেমন ভালো হল না। কারণ—আমাদের সকলকে গাদাগাদি করে রাখা হয়েছিল জাহাজের খোলের মধ্যে। বেশিরভাগ লোক তো শ্বাসকষ্টেই মারা গেল; বাকি যারা বেঁচে রইল তাদের যে কী অবস্থা তা ঈশ্বরই জানেন। ডাঙায় নামার পর আমাদের বেচে দেওয়া হল এক বাগান-মালিকের কাছে। আমি সাত বছর বাঁধা রইলুম ওখানে। পড়াশোনা তো করতে পারিনি, অক্ষরজ্ঞানই হয়নি আমার; তাই আমাকে নিগ্রোদের সঙ্গে কাজ করতে হত। যাই হোক, আমার বাঁধা কাজ আমি ঠিকঠাক করতুম।

'ওখানকার মেয়াদ শেষ হলে, আমি কোনোক্রমে খরচাপাতি জোগাড় করে ফিরে এলুম। ভারী ভালো লাগল বহুদিন পরে আমার প্রিয় স্বদেশ ইংল্যান্ডে আবার ফিরে আসতে পেরে। আমার ভয় ছিল, পাছে আমাকে 'ভবঘুরে' বলে আবার ধরে নিয়ে যায়। তাই আমি গ্রামে বড়ো একটা যেতুম না। শহরের আশেপাশেই থাকতুম, টুকটাক কাজ পেলে করতুম।

'এইভাবে কিছুদিন বেশ সুখেই ছিলুম। হঠাৎ একদিন সন্ধেবেলা কাজ থেকে ফেরার পথে দুটো লোক আমায় বেদম মেরে মাটিতে ফেলে দিল, তারপর বলল উঠে দাঁড়াতে। ওরা প্রেস গ্যাং-এর লোক। আমাকে নিয়ে গেল বিচারকের কাছে। আমি ঠিকমতো নিজের পরিচয় দিতে পারলুম না। কাজেই বলা হল, 'তোমাকে যুদ্ধবন্দি হিসেবে চালান করে দেওয়া হবে, না সৈনিকের দলে নাম লেখাবে—বেছে নাও।' আমার দ্বিতীয়টাই পছন্দ হল। এই একটা ভদ্রলোকের মতো কাজে আমি দুটো যুদ্ধে কাজ করেছিলুম; একবারই মাত্র আহত হয়েছি বুকের এইখানটায়। কিন্তু আমাদের রেজিমেন্টের ডাক্তার খুব তাড়াতাড়ি আমাকে সারিয়ে তুলল।

'যুদ্ধশান্তি চুক্তির পর আমাকে বরখাস্ত করা হল, কারণ আমি তখন ভালোমতো কাজ করতে পারতুম না, বুকের ব্যথাটা আমাকে মাঝে মাঝে বেশ জ্বালাত। কিছুদিন পর আমি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির পল্টনে নাম লেখালুম। ছটা বড়ো লড়াইয়ে আমি ফরাসিদের বিরুদ্ধে লড়েছি। আমার বিশ্বাস আমি যদি পড়তে লিখতে জানতুম তাহলে আমাদের ক্যাপ্টেন আমাকে 'কর্পোরাল' পদে বহাল রাখত। কিন্তু আমার কপালে পদোন্নতি নেই; কিছুদিনের মধ্যেই আমি অসুস্থ হয়ে পড়লুম, তাই ছুটি নিয়ে দেশে ফিরে আসব ঠিক করলুম। আমার পকেটে তখন চল্লিশ পাউন্ড। এই যুদ্ধটার তখন সবে শুরু। আশা ছিল দেশে নেমে কিছুদিন থেকে ওই চল্লিশ পাউন্ড মনের সুখে খরচ করব। কিন্তু সরকারের তখন আরও লোক চাই, তাই ডাঙায় নামার আগেই আমাকে নাবিক বানিয়ে দেওয়া হল।

'জাহাজের সারেং বলল, আমি নাকি ভারী অবাধ্য; ও নাকি জানে আমি আমার কাজ বেশ ভালোই বুঝি, তবু খাটনি এড়ানোর জন্য মিথ্যে ভান করছি। ঈশ্বর জানেন আমি জাহাজের কাজকর্ম কিছুই জানতুম না। ও তা না বুঝেই আমাকে বেদম ঠ্যাঙাল। তবু অত মার খেয়েও আমার একটা সান্ত্বনা ছিল আমার চল্লিশ পাউন্ড সঞ্চয়। ওটা হয়তো আজও আমার জমানো থাকত, কিন্তু ফরাসিরা

আমাদের জাহাজ দখল করে নিল, আর আমার সর্বস্ব গেল। আমাদের জাহাজের সব কর্মচারীকে ব্রেস্ট-এ নিয়ে যাওয়া হল। অনেকেই মারা গেল কারণ তারা জেল-জীবনে অভ্যস্ত ছিল না; কিন্তু আমার কাছে জেলে থাকা কোনো ব্যাপারই নয়, আমি তো তখন পোক্ত হয়ে গেছি। একদিন রাতে, আমি কাঠের পাটাতনে শুয়ে ঘুমোচ্ছিলুম, গায়ে কম্বল জড়িয়ে; চিরকালই একটু আরাম করে শুতে ভালোবাসি আমি। হঠাৎ সারেং-এর ডাকে জেগে উঠলুম। ওর হাতে একটা লন্ঠন। বলল, জ্যাক, ফরাসি সেন্ট্রিটাকে পেড়ে ফেলতে পারবে? ঘুমের ঘোর কাটিয়ে বললুম, সাহায্য করতে আপত্তি নেই। ও বলল, তবে এসো আমার সঙ্গে; আশা করি দুজনে মিলে কাজটা করতে পারব। কাজেই উঠে পড়লুম। প্রথমেই কম্বলটাকে কোমরে বেঁধে নিলুম, কারণ নিজের বলতে ওই একটা জিনিসই তখন আমার সম্বল। ওর সঙ্গে গেলুম ফরাসিটার সঙ্গে লড়তে। ফরাসিদের আমি অপছন্দ করতুম কারণ ওরা সবাই ক্রীতদাস আর পায়ে কাঠের জুতো পরে।

'আমাদের হাতে কোনো অস্ত্র ছিল না বটে, তবে একজন ইংরেজ অন্তত পাঁচজন ফরাসির মোকাবিলা করতে পারে। আমরা দরজার কাছে গিয়ে দেখি একজন নয়, দুপাশে দুজন সেন্ট্রি। আমরা আচমকা ওদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে মুহূর্তের মধ্যে ওদের অস্ত্র কেড়ে নিয়ে মাটিতে শুইয়ে দিলুম। তারপর সেখান থেকে আমরা নজন বন্দি ছুটলুম জাহাজঘাটার দিকে। সামনে যে নৌকোটা পেলুম সেটাতেই চড়ে পাড়ি দিলুম সমুদ্রে। তিনদিন গেল না একটা বেসরকারি যুদ্ধজাহাজ আমাদের ধরে ফেলল। তারা তো এতগুলো জোয়ান লোক পেয়ে খুব খুশি। আমরা ভাগ্যের হাতে নিজেদের ছেড়ে দিলুম। কিন্তু ভাগ্য আমাদের সহায় হল না। দিন কয়েক বাদেই একটা ফরাসি যুদ্ধজাহাজের সঙ্গে আমাদের লড়াই লাগল। ওদের ছিল চল্লিশটা কামান, আর আমাদের মাত্র তেইশটা। তিনঘণ্টা ধরে লড়াই চলল। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, যদি আরও কয়েকজন লোক আমাদের বেঁচে থাকত, তাহলে আমরা নিশ্চয় ফরাসিদের হারাতে পারতুম। কিন্তু দুর্ভাগ্য, আমরা যখন প্রায় জেতার অবস্থায় তখনই আমাদের প্রায় সবাই প্রাণ হারাল।

'ফলে আবার আমি ফরাসিদের কবলে পড়লুম। আমাকে যদি ব্রেস্ট-এর জেলখানায় ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হত তাহলে আমার অবস্থা আরও খারাপ হত। কিন্তু কপাল ভালো, আমাদের তুলে দেওয়া হল আরেকটা যুদ্ধজাহাজে। বলতে ভুলে গেছি, ওই ভয়ংকর লড়াইয়ে আমার দুটো জায়গায় আঘাত লেগেছিল; আমার বাঁ হাতের চারটে আঙুল আর এই পা-টা কামানের গোলায় উড়ে গেছিল। হাতের আঙুলগুলো না হারিয়ে যদি শুধু পা-টা হারাতুম, তাহলে আমি সরকারি জাহাজে কাজ করতে পারতুম, বেসরকারি জাহাজে থাকতে হত না; তাহলে বাকি জীবনটা আমার খাওয়া-পরার অভাব হত না। কিন্তু আমার ভাগ্যে তা নেই। কেউ জন্মায় রুপোর চামচ মুখে নিয়ে, কেউ বা কাঠের চামচ।

'যাই হোক, ঈশ্বরের কৃপায় আমি সুস্থ আছি। আর যতদিনই বাঁচি আমি চিরকাল ভালোবাসব স্বাধীনতা আর আমার স্বদেশ ইংল্যান্ডকে। স্বাধীনতা, সমৃদ্ধি আর আমার ইংল্যান্ড—চিরকাল! হুররে!'

কাহিনি শেষ করে সে ধীরে ধীরে খোঁড়াতে খোঁড়াতে এগিয়ে গেল; আর আমি দাঁড়িয়ে রইলাম ওই নির্ভীক আর চিরসন্তুষ্ট মানুষটির প্রতি বুকভরা প্রশস্তি নিয়ে।

স্বীকার করতে দ্বিধা নেই—দুঃখকষ্টের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ প্রত্যক্ষ পরিচয়ের ফলেই মানুষ দুঃখকষ্ট যতটা উপেক্ষা আর ঘৃণা করতে শেখে, কোনো দর্শনতত্ত্ব সে শিক্ষা দিতে পারে না।